لعب الظل
بالروح العاشقة
أشرف لإسلام دناكوشاوي

لَعِبُ الظِّلِّ بِالرُّوحِ الْعَاشِقَةِ

مَوْلَانَا أَشْرَفُ الإِسْلَامِ د نْاكُوشَاي

سَمَرُ الرَّمْلِ الدَّاكِنِ

عَشِقَ الظَّلَامُ قَمَرَهُ

لَيْلَى فِي قَفَصِ الرِّيحِ

رَمْلٌ يَبْكِي فَرَاقَ النَّجْمِ

وَعْدُ الرَّمَادِ

مقدمة المؤلف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

لَيسَ هَذَا كِتَابَ حُبٍّ عَادِيٍّ تَقْرَؤُهُ وَتَضَعُهُ عَلى الرَّفِّ. هَذَا كِتَابُ الَّذِينَ أَحَبُّوا حَتَّى احْتَرَقُوا، ثُمَّ نَهَضُوا مِنَ الرَّمَادِ لِيَجِدُوا أَنَّ ظِلَّهُمْ قَدْ فَارَقَهُمْ وَصَارَ عَاشِقاً آخَرَ.

فِي هَذِهِ الصَّفَحَاتِ، لَنْ تَجِدَ عِشْقاً وَرْدِيَّ اللَّوْنِ، وَلَنْ تَسْمَعَ وَعْداً كَعُودِ البَخُورِ. بَلْ سَتَغُوصُ فِي أَعْمَاقِ النَّفْسِ حَيْثُ يَلْتَقِي الْخَوْفُ بِالرَّغْبَةِ، وَالْجُنُونُ بِالْحَنِينِ. كُلُّ قِصَّةٍ هُنَا هِيَ مِعْرَاجٌ إِلَى ظِلِّكَ الأَسْوَدِ – ذَلِكَ الْجُزْءِ مِنْكَ الَّذِي يُحِبُّ بِغَيْرِ شَرْطٍ، وَيَكْرَهُ بِغَيْرِ سَبَبٍ، وَيَتَمَلَّكُ الأَرْوَاحَ كَمَا يَتَمَلَّكُ السَّرَابُ العَطْشَانَ.

سَتَقْرَأُ عَنْ لَيْلَى الَّتِي كَانَتْ رِيحاً فِي قَفَصِ الْكَلِمَاتِ، وَزَايِدَ الَّذِي عَشِقَ الظَّلَامَ حَتَّى صَارَ الظَّلَامُ قَمَرَهُ. سَتَشَمُّ رَائِحَةَ الرَّمْلِ الأَسْوَدِ وَتَسْمَعُ وَعْداً لا يُوفَى إلاَّ بِالنَّارِ. هَذِهِ لَيْسَتْ خُرَافَاتِ البَوَادِي؛ هَذِهِ تَشْرِيحُ الرُّوحِ الْعَاشِقَةِ حِينَ تَفْقِدُ ظِلَّهَا فِي زِحَامِ الضَّمِيرِ.

أَنَا مَوْلَانَا أَشْرَفُ الإِسْلَامِ دَهَانْكُوشَاي. لَمْ أَكْتُبْ هَذِهِ الْقَصَصَ لِتُسَلِّيَكَ، بَلْ لِتُزَعْزِعَ مَا اسْتَقَرَّ فِي صَدْرِكَ مِنْ أَوْهَامِ الْحُبِّ النَّقِيِّ. لِأَنَّ الْحُبَّ حِينَ يَكُونُ دَاكِناً، يُضِيءُ الأَبْعَادَ الَّتِي لَمْ تَكُنْ تَرَاهَا قَطُّ.

إِذَا كُنْتَ تَبْحَثُ عَنْ سَلَامٍ، فَأَغْلِقِ الْكِتَابَ. أَمَّا إِذَا كُنْتَ مُسْتَعِدّاً أَنْ يَلْعَبَ ظِلُّكَ بِرُوحِكَ... فَتَعَالَ.

وَعْدِي لَكَ: بَعْدَ أَنْ تَنْتَهِيَ مِنْ هَذِهِ الصَّفَحَاتِ، سَتَنْظُرُ إِلَى مِرْآتِكَ طَوِيلاً. فَرُبَّمَا تَرَى أَنَّ مَنْ يُحِبُّ فِي الظِّلِّ، هُوَ أَنْتَ نَفْسُكَ.

ভূমিকা – লেখক: মাওলানা আশরাফুল ইসলাম ধানকুশা

এটি সাধারণ প্রেমের বই নয়, যেটা পড়ে তাকেই রেখে দেবে বইয়ের তাকে। এটি তাদের বই – যারা ভালোবেসে পুড়ে ছাই হয়েছে, তারপর ছাই থেকে উঠে দেখেছে তাদের নিজের ছায়া তাদের ছেড়ে অন্য এক প্রেমিকে বরণ করে নিয়েছে।

এই পাতাগুলোতে তুমি পাবে না গোলাপি রঙের আবেশ, শুনতে পাবে না আগরবাতির মিষ্টি প্রতিশ্রুতি। বরং তুমি ডুব দেবে আত্মার সেই অতল গহ্বরে, যেখানে ভয় আর কামনা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে, পাগলামি আর বিষাদ একসাথেও নাচে। প্রতিটি গল্প এখানে তোমার ভেতরের কালো ছায়ার উদ্দেশে এক সিঁড়ি – সেই ছায়া, যা ভালোবাসে বিনা শর্তে, ঘৃণা করে বিনা কারণে, আর আত্মাকে এমন করে ধরে যেমন মরীচিকা ধরে পিপাসুকে।

তুমি পড়বে লায়লার কথা – যে ছিল বাতাস, কিন্তু আটকা পড়েছিল শব্দের খাঁচায়। আর জায়েদ – যার অন্ধকার নিজেই এক চাঁদ হয়ে উঠেছিল। তুমি টের পাবে কালো বালির গন্ধ। শুনতে পাবে সেই প্রতিশ্রুতি যা কেবল আগুনেই পালন করা যায়। এসব যাযাবরের রূপকথা নয়; এ হলো প্রেমিক আত্মার শব্দহীন ব্যবচ্ছেদ – যখন বিবেকের ভিড়ে সে তার নিজের ছায়া হারিয়ে ফেলে।

আমি মাওলানা আশরাফুল ইসলাম ধানকুশা। এই গল্পগুলো লিখিনি তোমাকে বিনোদন দিতে; লিখেছি তোমার বুকের ভেতর জমে থাকা 'নির্মল প্রেম'-এর ভ্রমগুলোর ভিত কাঁপিয়ে দিতে। কারণ যখন প্রেম গাঢ় অন্ধকারে ডুবে যায়, তখন সে সেই সব দিগন্তও জ্বালিয়ে দেয় যা তুমি কখনো দেখোনি।

যদি শান্তি খুঁজতে এসে থাকো, তাহলে এই বই বন্ধ করে দাও। কিন্তু যদি প্রস্তুত থাকো – যদি প্রস্তুত থাকো যে তোমার ছায়া তোমার আত্মার সঙ্গে খেলা করবে... তাহলে আসো।

আমার প্রতিশ্রুতি: এই পাতাগুলো পড়া শেষ করার পর, তুমি অনেকক্ষণ আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে থাকবে। কারণ হয়তো তখন দেখতে পাবে – যে ছায়া অন্ধকারে ভালোবাসে, সেই ছায়া আসলে তুমি নিজেই।

ভূমিকা সমাপ্ত

ضاعَ زايدٌ في الصحراء أثناءَ عاصفةٍ رمليةٍ. لجأَ إلى خانٍ قديمٍ مهجورٍ. في الليلِ رأى امرأةً تجلسُ وحدها عند النارِ، تُغنّي بصوتٍ حزينٍ. اقتربَ منها، فقالت له: «لا تنظُرْ إليَّ. مَن ينظرُ إليَّ لا يبقى طبيعياً». لم يَخَفْ زايدٌ بل ازدادَ فضولاً.

في الصباحِ اختفتِ المرأةُ. وجدَ زايدٌ تميمةً من فضةٍ مكتوباً عليها: «أنا ذلك الحبُّ الذي يُري الإنسانَ ظلامَه». عندما عادَ إلى قبيلتِه، قال له صديقُه راشدٌ: «أعرفُ هذه المرأةَ. اسمها لَيلى. قَبيلَتُها طردَتْها لأنها ملعونةٌ. مَن يُحبُّها يَهلكُ». ضحكَ زايدٌ: «إذاً سأهلكُ». راشدٌ خافَ عليه. لكن زايداً خرجَ إلى الصحراءِ يبحثُ عن ليلى.

وَجَدَها في واحةٍ خفيَّةٍ. بكتْ وقالت: «لماذا جئتَ؟ أنا لا أريدُ لأحدٍ أن يُحبَّني». سألها عن لعنتِها. قالت: «أولُ حبيبٍ لي (أسدٌ) تركَني وتزوَّجَ غيري. فدعوتُ عليه: لِيَهِمْ في الصحراءِ وحيداً. والآنَ هو مجنونٌ يهيمُ». لم يَرْتَعِبْ زايدٌ، بل قال: «اللعنةُ هي عمقُ الحبِّ. أنتِ أحببتِهِ حقاً لذلك حدثَ ما حدث». نظرتْ إليه نظرةً ضعيفةً.

أمضيا أياماً في الواحة. جاء راشدٌ ليُعيدَ زايداً لكنه رفضَ. فقبَّلتْ ليلى زايداً أمامه. عاد راشدٌ غضباناً. في الليلِ اعترفتْ ليلى: «ما زلتُ لم أنسَ أَسَداً. إن أحببتَني فستَجنُّ أيضاً. لكنّي أريدُك أن تبقى». أمسك زايدُ يدَها وقال: «لأجنهَنَّ، لكنني الآنَ في الجنةِ».

عندما عاد زايدٌ إلى قبيلتِه، علِمَ أن راشداً أخبرَ الجميعَ بأن ليلى ملعونةٌ. أمرَ أبوه بتركِها فعصى. ذات يوم ذهبَ إلى الواحةِ فرأى ليلى تتحدثُ مع أَسَدَ. كان يرتجفُ وهي تسقيهِ الماءَ. شعر زايدٌ بالغيرةِ. قال لليلى: «إما هو أو أنا». بكت: «أنا أخدمُ أَسَداً لأني دعوتُ عليه. أنت حبيبي، لكني لا أستطيعُ لمسَكَ حتى يبرأَ من جنونِه».

في الليلِ وجدَ أسَدَ وحده فصرخَ به: «ارحلْ من هنا». اندفعَ أسَدٌ نحوه وكاد يخنقُه. دفعه زايدٌ فسقطَ رأسُ أسَدَ على حجرٍ ونزفَ. ظنَّ أنه قتله، لكن أسَدَ نجا. شعرَ بالذنبِ. ابتعدتْ عنه ليلى قائلةً: «ظلامٌ بدأَ في داخلك. نحتاجُ إلى انفصالٍ».

توقفت ليلى عن لقائِه. كان يأتي كلَّ يومٍ إلى الواحةِ فلا يجدُ إلا أوراقاً يابسةً ورداءً تركَتْه. كان ينامُ والرداءُ على صدره. ترك الطعامَ وتضوّرَ جوعاً وهو يضحك: «هذا هو لونُ الحبِّ الحقيقي». رأى سرابَ ليلى في الصحراءِ فركضَ وسقطَ، جُرحت ركبتهُ. نظرَ إلى دمِه وابتسمَ. جاء راشدٌ وأنقذه. ظنَّ الجميعُ أنه شُفيَ، لكنه كان يخرجُ ليلاً.

وقفَ عند بئرٍ قديمةٍ قربَ الواحةِ وصاح: «ليلى! إن لم تأتي سأقفزُ في البئرِ». جاءت في ظلامِ الليلِ، وجهها شاحبٌ. قالت: «جنونُك يُخيفني. لكني جئتُ لأني أيضاً لا أستطيعُ العيشَ بدونِك. لكن أسَداً مريضٌ لا أستطيعُ تركَه». اقترح زايدٌ: «لنعشْ نحن الثلاثة معاً. أنتِ تخدمينَ أسَدَ وأنا أبقى بجانبكِ». وافقت باكيةً.

مرَّت أيامٌ هادئة. لكن أسَدَ فتحَ عينيه ليلاً وهمسَ لزايدٍ: «هي حبيبتي، لا حبيبتُك. ارحلْ». عادت الغيرةُ إلى قلب زايدٍ. في ليلةٍ عاصفةٍ، حاولَ أن يدفعَ أسَدَ إلى البئرِ، لكنه توقَّفَ في اللحظةِ الأخيرةِ. أدركَ أنه سيصيرُ قاتلاً. قرَّرَ أن يتركَ ليلى ويرحلَ. قال لها: «سأرحلُ قبل أن يلتهمني جنونُك. أريدُ أن أعيشَ». بكت: «ألنْ تلعنَني؟» قال: «لا، بل سأدعو لكِ: مَن يُحبُّكِ فليَعِشْ».

بعد ثلاثِ سنواتٍ، كان زايدٌ في السوقِ الليلي. رأى امرأةً بعيدةً ترتدي رداءً أزرقَ – رداءَ ليلى. اقتربتْ منه ثم اختفتْ في الزحامِ. ركضَ فلم يجدْ شيئاً. وقفَ حاملاً تميمةَ الفضةِ القديمةَ.

هل كانت سراباً أم حقيقية؟ لا أدري. لكني أعلم أني أحببتُها يوماً، لذلك كلَّ ليلةٍ صحراويةٍ أبقى أتمنى – لعلَّها تعود. الحبُّ المظلمُ لا ينتهي، بل يُعلِّمُنا الانتظارَ.

سَمَرُ الرَّمْلِ الدَّاكِنِ

(কালো বালির রাতের কাহিনি)
উপশিরোনাম: একটি নিষিদ্ধ প্রেমের আকাঙ্খার গল্প

অধ্যায় ১: ছায়ার দেখা (ঘটনা ১-৫)

জায়েদ, এক যাযাবর তরুণ, মরুভূমির ঝড়ে পথ হারিয়ে ফেলে। আশ্রয় নেয় এক পুরনো ক্যারাভানসরাইতে। সেখানে রাতে হঠাৎ দেখে এক নারী (লায়লা) আগুনের পাশে বসে একা গান করছে। কণ্ঠে বিষাদ।
জায়েদ কাছে গেলে লায়লা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। বলে, “আমার দিকে তাকিও না। যারা আমার দিকে তাকায়, তারা আর স্বাভাবিক থাকে না।” জায়েদ ভয় পায় না, বরং কৌতূহলী হয়।
পরদিন সকালে লায়লা চলে যায়। জায়েদ খোঁজাখুঁজি করে শুধু একটি রুপার তাবিজ পায়, যাতে খোদাই করা: “আমি সেই প্রেম যা মানুষকে নিজের অন্ধকার দেখায়।”
গোত্রে ফিরে জায়েদের বন্ধু রাশিদ বলে, “ওই মেয়েকে আমি চিনি। ওর নাম লায়লা, বনু তাহা গোত্রের। ওর পরিবার ওকে ‘অভিশপ্ত’ বলে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। কারণ ও যাকে প্রেম করে, সে ধ্বংস হয়ে যায়।”
জায়েদ হেসে বলে, “তাহলে আমি ধ্বংস হব নাকি?” রাশিদ ভয় পেয়ে তাকে নিষেধ করে। কিন্তু জায়েদ মরুভূমির পথ ধরে লায়লার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে।

অধ্যায় ২: নিষিদ্ধ মরুদ্যান (ঘটনা ৬-১০)

জায়েদ লায়লাকে খুঁজে পায় এক গুপ্ত মরুদ্যানে। লায়লা তাকে দেখে কাঁদতে শুরু করে: "তুমি কেন এলে? আমি চাইতাম না কেউ আমাকে ভালোবাসুক।"
জায়েদ জানতে চায় তার 'অভিশাপ' কী। লায়লা বলে, "আমার প্রথম প্রেমিক (আসাদ) আমাকে ছেড়ে অন্য মেয়ে বিয়ে করেছিল। আমি অভিশাপ দিয়েছিলাম – সে যেন আজীবন একা ঘুরে বেড়ায়। আসাদ সত্যিই পাগল হয়ে মরুভূমিতে ঘুরছে এখন।"
জায়েদ শঙ্কিত হয় না, বরং বলে, "অভিশাপ আসলে প্রেমের গভীরতা। তুমি তাকে সত্যি ভালোবেসেছিলে বলেই এমন হয়েছিল।" লায়লা তীব্র দৃষ্টিতে তাকায় – প্রথমবার তার মধ্যে দুর্বলতা আসে।
তারা দিনের পর দিন মরুদ্যানে কাটায়। কিন্তু জায়েদের বন্ধু রাশিদ এসে জায়েদকে ফিরতে বলে। জায়েদ মানতে চায় না। লায়লা রাশিদের সামনে জায়েদকে চুমু খায় – রাশিদ লজ্জায় ও রাগে ফিরে যায়।
রাতে লায়লা স্বীকার করে: "আমি এখনো আসাদকে ভুলতে পারিনি। তুমি যদি আমার প্রেমে পড়ো, তুমিও হয়তো পাগল হয়ে যাবে। তবুও আমি চাই তুমি থাকো।" জায়েদ তার হাত ধরে বলে, "পাগলামি হোক, তবুও এই মুহূর্তে আমি স্বর্গে আছি।"

অধ্যায় ৩: হিংসার বীজ (ঘটনা ১১-১৫)

গোত্রে ফিরে জায়েদ জানতে পারে রাশিদ সবাইকে বলেছে যে লায়লা 'অভিশপ্তা'। জায়েদের বাবা তাকে লায়লা ছাড়ার নির্দেশ দেয়। জায়েদ বিদ্রোহ করে।
একদিন জায়েদ মরুদ্যানে এসে দেখে লায়লা আসাদের সঙ্গে কথা বলছে। আসাদ উন্মাদপ্রায়, হাত পা কাঁপে। লায়লা তাকে পানি খাওয়াচ্ছে। জায়েদের ভেতর হিংসা জাগে।
জায়েদ লায়লাকে বলে, "আমি না তাকে বেছে নেবে, না আমাকে?" লায়লা কাঁদে: "আমি আসাদকে শুধু সেবা করছি, কারণ আমি তাকে অভিশাপ দিয়েছিলাম। তুমি আমার প্রেম, আমি ততক্ষণ তোমাকে স্পর্শ করতে পারি না যতক্ষণ আসাদের মনের পাগলামি না সারে।"
জায়েদ রাতে আসাদকে একা পেয়ে ধমক দেয়, "তুই এখান থেকে চলে যা।" আসাদ হঠাৎ জায়েদের গলা টিপে ধরে – জায়েদ আত্মরক্ষার্থে তাকে ঠেলে দেয়, আসাদের মাথায় পাথর লেগে রক্ত ঝরে। লায়লা এসে দেখে।
অবসেশনের প্রথম ধাপ – জায়েদ ভাবে, সে আসাদকে হত্যা করেছে? আসাদ বেঁচে যায়, কিন্তু জায়েদের ভেতর সেই ভয় ও অপরাধবোধ প্রতিরাতে তাকে জাগায়। লায়লা জায়েদকে দূরে সরিয়ে দেয়: "তোমার মধ্যেও অন্ধকার আসছে। বিরতি দরকার।"

অধ্যায় ৪: বিরহ ও আবেশ (ঘটনা ১৬-২০)

লায়লা জায়েদের দেখা দেয়া বন্ধ করে দেয়। জায়েদ প্রতিদিন মরুদ্যানে যায় – সেখানে শুধু শুকনো পাতা ও ফেলে যাওয়া ওড়না। সে সেই ওড়না বুকে নিয়ে ঘুমায়।
আত্ম-বিনাশের ঝোঁক – জায়েদ খাওয়া ছেড়ে দেয়। ক্ষুধায় কাতর হয়, কিন্তু ব্যথাকে ভালোবাসা মনে করে। একদিন মরুভূমির মাঝে লায়লার মরীচিকা দেখে – ছুটে গিয়ে পড়ে যায়, হাঁটু কেটে যায়। রক্ত দেখে হাসে: "এটাই প্রেমের আসল রঙ।"
বন্ধু রাশিদ জায়েদকে বাঁচাতে এসে দেখে সে অর্ধমৃত। রাশিদ তাকে গোত্রে ফিরিয়ে আনে। চিকিৎসা শেষে জায়েদ হঠাৎ শান্ত হয়। সবাই ভাবে সে সুস্থ হয়েছে।
কিন্তু রাতে জায়েদ গোপনে উঠে যায়। সে মরুদ্যানের কাছের এক পুরনো কুয়োর ধারে গিয়ে চিৎকার করে: "লায়লা! তুমি না এলে আমি কুয়োতে লাফ দেব!"
লায়লা আসে – অন্ধকার রাতে, মুখ ফ্যাকাশে। বলে, "তোমার এই পাগলামি আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। তবুও আমি এলাম, কারণ আমিও তোমাকে ছাড়া থাকতে পারছি না। তবে আসাদকে ছেড়ে আসতে পারি না – সে এখন অসুস্থ।"

অধ্যায় ৫: দুঃখের চাঁদ (ঘটনা ২১-২৫) – ওপেন এন্ডিং

জায়েদ প্রস্তাব দেয়: “আমরা তিনজন মিলে থাকব। তুমি আসাদের সেবা করবে, আমি তোমার পাশে থাকব।” লায়লা মেনে নেয় – এটাই সম্ভবত সমঝোতা।

কিছুদিন ভালই চলছে। কিন্তু আসাদ একদিন রাতে চোখ মেলে জায়েদকে দেখে ফিসফিস করে: “সে আমার প্রেমিকা, তোর নয়। তুই চলে যা।” জায়েদের ভেতরের হিংসা আবার জেগে ওঠে।

প্রেম-ঘৃণার দ্বন্দ্ব – এক ঝড়ের রাতে জায়েদ আসাদকে কুয়োর ধারে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে থামায়। সে বুঝতে পারে সে খুনি হয়ে যাচ্ছে। সেখানেই লায়লাকে বিদায় জানিয়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

জায়েদ লায়লাকে বলে, “আমি চলে যাচ্ছি, তোমার পাগলামি আমাকে গ্রাস করবে আগে। আমি বাঁচতে চাই।” লায়লা কাঁদে – “তুমি আমাকে অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছ না?” জায়েদ বলে, “অভিশাপ নয়, বরং দোয়া করি, তুমি যার ভালোবাসা পাও, সে যেন বাঁচে।”

ওপেন এন্ডিং – বছর তিনেক পর জায়েদ এক রাতে রাতের বাজারে ঘুরছে। দূর থেকে এক নারী ঘোমটায় মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে। ওড়নার রং নীল – লায়লার সেই নীল ওড়না। নারীটি এগিয়ে আসে, কিন্তু বাজারের ভিড়ে মানুষ মিলিয়ে যায়। জায়েদ ছুটে গিয়ে দেখে সেখানে কিছু নেই – শুধু বালি আর মশালের ধোঁয়া। সে দাঁড়িয়ে থাকে, হাতে সেই পুরনো রূপার তাবিজ। শেষ লাইন:

“সে ছিল কি মরীচিকা? নাকি সত্যি? আমি জানি না। কিন্তু জানি, তাকে একবার ভালোবেসেছিলাম বলে প্রতিটি মরুভূমির রাতে আমি এখনও আশায় থাকি – হয়তো সে ফিরবে। অন্ধকার প্রেম কখনো শেষ হয় না, শুধু অপেক্ষা করতে শেখায়।”

عَشِقَ الظَّلَامُ قَمَرَهُ

كَانَ لِلظَّلَامِ قَمَرٌ، وَكَانَ لِلْقَمَرِ اسْمٌ: لَيْلَى.

فِي قَلْبِ الصَّحْرَاءِ، حَيْثُ الرِّمَالُ تَلْعَقُ السَّمَاءَ، عَاشَ شَابٌّ اسْمُهُ زَايِدٌ. كَانَ زَايِدٌ مُهْتَمَّاً بِالنُّجُومِ، يَقْضِي لَيَالِيَهُ مُحَدِّقاً فِي السَّمَاءِ، يَكْتُبُ أَسْمَاءَ النَّجُومِ عَلَى جِلْدِ الذَّاكِرَةِ. كَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ عَنْهُ: «إِنَّهُ يُحِبُّ الظَّلَامَ أَكْثَرَ مِنَ النُّورِ».

وَذَاتَ لَيْلَةٍ، بَيْنَمَا كَانَ جَالِساً عِنْدَ أَطْلَالٍ قَدِيمَةٍ، رَأَى ضَوْءاً بَعِيداً – لَيْسَ ضَوْءَ نَجْمٍ، بَلْ ضَوْءَ عَيْنَيْنِ. عَيْنَايِ امْرَأَةٍ جَالِسَةٍ وَحْدَهَا، تَنْظُرُ إِلَيْهِ كَأَنَّهَا تَعْرِفُهُ مُنْذُ الأَزَلِ.

تَقَدَّمَ نَحْوَهَا، فَقَالَتْ: «لَا تَقْتَرِبْ. أَنَا لِلظَّلَامِ، وَأَنْتَ تَبْحَثُ عَنِ الْقَمَرِ».

قَالَ: «وَمَنْ قَالَ إِنَّ الظَّلَامَ لَا يَعْشَقُ الْقَمَرَ؟»

ابْتَسَمَتْ. ذَلِكَ الابْتِسَامُ كَانَ كَطَعْنَةِ سِكِّينٍ حُلْوَةٍ فِي قَلْبِهِ.

هِيَ لَيْلَى. ابْنَةُ قَبِيلَةِ الرِّمَالِ السَّوْدَاءِ. قَبِيلَةٌ تَعْبُدُ الصَّمْتَ، وَتُحَرِّمُ الْحُبَّ. كَانَ شَرَفُهَا كَالسَّيْفِ عَلَى رَقَبَتِهَا. وَأَمَّا هُوَ، فَكَانَ غَرِيباً – رَجُلاً مِنْ لَا مَكَانَ، يَكْتُبُ الشِّعْرَ عَلَى جُدْرَانِ الْخَرَائِبِ.

لَقِيَهَا ثَانِيَةً فِي سُوقٍ لَيْلِيٍّ. كَانَتِ الْأَضْوَاءُ خَافِتَةً، وَالرِّيحُ تَحْمِلُ رَائِحَةَ العُودِ وَالْحَنِينِ.

دَنَا مِنْهَا وَهَمَسَ فِي أُذُنِهَا: «لِمَ تَهْرُبِينَ مِنِّي كَالسَّرَابِ؟»

هَزَّتْ رَأْسَهَا: «لِأَنَّ الْحُبَّ مَمْنُوعٌ. وَأَنْتَ – إِنْ عَشِقْتَنِي – سَتَكُونُ نِهَايَتُكَ الظَّلَامَ الدَّائِمَ».

قَالَ: «فَلْيَكُنْ. فَالظَّلَامُ أَنْتَ، يَا قَمَرِيَ الصَّغِيرَ».

كَانَ يَلْقَاهَا كُلَّ لَيْلَةٍ تَحْتَ سَمَاءٍ بَعِيدَةٍ، حَيْثُ لَا تَرَاهُمْ عُيُونُ الْقَبِيلَةِ. كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ. يَضْحَكُونَ. بَعْضَ الأَحْيَانِ كَانَ يُغَنِّي، وَكَانَتْ تَبْكِي.

وَفِي لَيْلَةٍ، خَطَفَ يَدَهَا وَهْيَ لَا تَدْرِي، قَادَهَا إِلَى وَاحَةٍ مَهْجُورَةٍ. كَانَتِ النَّخِيلُ تَبْكِي شَيْئاً، وَالْمَاءُ يَعْكِسُ ضَوْءَ الْقَمَرِ. هُنَاكَ، قَالَ لَهَا:

«حَبِيبَتِي، أَنَا لَسْتُ ظِلاً، وَلَسْتِ أَنْتِ قَمَراً فَقَطْ. أَنْتِ مَوْطِنِي، إِنْ سَقَطْتِ مِنَ السَّمَاءِ، سَأَسْقُطُ مَعَكِ فِي الجَحِيمِ».

دَمَعَتْ عَيْنَاهَا. قالت: «إِنَّ قَبِيلَتِي سَتَقْتُلُكَ إِنْ عَلِمُوا».

قَالَ: «فَلْيَقْتُلُونِي. المَوْتُ مَعَكِ أَحْلَى مِنَ الْحَيَاةِ بِغَيْرِكِ».

لَكِنَّ الصَّحْرَاءَ تَسْمَعُ كُلَّ شَيْءٍ. كَلِمَاتُهُ حَمَلَتْهَا الرِّيَاحُ إِلَى آذَانِ أَبِي لَيْلَى. فَغَضِبَ، وَحَبَسَهَا فِي بَيْتٍ مِنْ طِينٍ، وَأَرْسَلَ رِجَالَهُ لِيَقْتُلُوا زَايِداً.

تَقَدَّمَ زَايِدٌ نَحْوَ المَوْتِ بِقَلْبٍ هَادِئٍ. كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ الحُبَّ الحَقِيقِيَّ يُبَارِكُ الجُرْحَ. نَجَا بِأَعْجُوبَةٍ، لَكِنَّهُ فَقَدَ بَصَرَ الذَّاكِرَةِ – صَارَ لَا يَذْكُرُ شَيْئاً إِلَّا اسْمَهَا.
سَنَتَانِ مَرَّتَا كَالنَّارِ عَلَى جِلْدِ الرِّمَالِ.
وَفِي لَيْلَةٍ، جَلَسَ زَايِدٌ مَرَّةً أُخْرَى عِنْدَ الأَطْلَالِ القَدِيمَةِ، حَيْثُ الْتَقَيَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. بَيْنَا هُوَ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ، إِذَا بِنَفْسِ العَيْنَيْنِ تَظْهَرَانِ فِي الظَّلَامِ.
لَيْلَى! هَرَبَتْ مِنْ سِجْنِ أَبِيهَا.
جَرَتْ نَحْوَهُ، سَقَطَتْ فِي حِضْنِهِ. مَا تَكَلَّمَا. الأَيْدِي وَالأَشْوَاقُ هِيَ الَّتِي تَكَلَّمَتْ.
فِي مَنْزِلِ زَايِدٍ الصَّغِيرِ عَلَى حَافَّةِ الصَّحْرَاءِ، بَدَأَا حَيَاةً هَادِئَةً. كَانَا يَخْبِيَانِ حُبَّهُمَا كَنَارٍ تَحْتَ الرَّمَادِ. لَكِنَّ الرِّيَاحَ بَاحَتِ السِّرَّ.
جَاءَ رِجَالُ القَبِيلَةِ ذَاتَ فَجْرٍ. حَاصَرُوا البَيْتَ. كَانَتِ الشُّمُوعُ مُضَاءَةً، وَزَايِدٌ يَشْرَبُ القَهْوَةَ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى لَيْلَى فِي عَيْنَيْهَا. قَالَ لَهَا:
«هَلْ تَنْدَمِينَ؟»
قَالَتْ: «لَوْ كَانَ العُمْرُ لَيْلَةً وَاحِدَةً مَعَكَ، لَمَا انْدَمْتُ. وَلَوْ كَانَ العُمْرُ أَلْفَ لَيْلَةٍ فِي سِجْنِ أَبِي، لَندِمْتُ».
ثُمَّ فُتِحَ البَابُ بِعُنْفٍ.
لَكِنَّ زَايِداً كَانَ قَدْ تَوَقَّعَ ذَلِكَ. كَانَ قَدْ حَفَرَ نَفَقاً صَغِيراً خَلْفَ البَيْتِ – لا يَسَعُ إِلَّا جَسَدَينِ. أَمْسَكَ بِيَدِ لَيْلَى وَهَمَسَ: «اهْرُبِي مَعِي».
هَرَبَا تَحْتَ زَفِيرِ الرِّمَالِ، تَحْتَ غَضَبِ القَبِيلَةِ، تَحْتَ سَوْطِ القَمَرِ الَّذِي رَآهُمَا وَلَمْ يَعُدْ يُضِيءُ إِلَّا مِنْ أَجْلِهِمَا.
بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ العَطَشِ وَالجَرْيِ، وَصَلَا إِلَى وَادٍ بَعِيدٍ، حَيْثُ لَا تَصِلُ أَصْوَاتُ القَبَائِلِ. هُنَاكَ شَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَكُوخٌ قَدِيمٌ، وَبِئْرُ مَاءٍ.
قَالَتْ لَيْلَى: «هَذِهِ نِهَايَتُنَا؟»
قَالَ زَايِدٌ: «لا، هَذِهِ بِدَايَةُ عُمْرِنَا الثَّانِي. سَنَبْنِي هُنَا بَيْتاً. وَنَزْرَعُ نَخْلَةً. وَنُسَمِّيهَا لَيْلَى».
ضَحِكَتْ لِلْمَرَّةِ الأُولَى مُنْذُ سَنَتَيْنِ. ضِحْكَةً كَانَتْ أَحْلَى مِنَ النَّبِيذِ فِي لَيَالِي الصَّيْفِ.
انْتَهَتِ القِصَّةُ؟ لا، لَمْ تَنْتَهِ. لأَنَّ الحُبَّ الَّذِي يَعْشَقُهُ الظَّلَامُ لَا يَمُوتُ أَبَداً.
وَلَكِنْ، يَا قَارِئِي، هَلْ تَعْلَمُ مَنْ هُوَ الزَّايِدُ الحَقِيقِيُّ؟ وَمَنْ هِيَ اللَّيْلَى الحَقِيقِيَّةُ؟

أَنَا أَعْرِفُ. وَلَكِنِّي لَنْ أَقُولَ.
لأَنَّ الحُبَّ سِرٌّ بَيْنَ الظَّلَامِ وَقَمَرِهِ.
وَسِرِّي مَعَكَ.
انتهت القصة

অন্ধকার তার চাঁদকে ভালোবেসেছিল

অন্ধকারের একটি চাঁদ ছিল, আর সেই চাঁদের নাম ছিল লায়লা।

মরুভূমির বুকে, যেখানে বালি আকাশকে চেটে খায়, সেখানে বাস করত জায়েদ নামের এক যুবক। জায়েদ ছিল নক্ষত্রপ্রেমী। সে সারারাত আকাশের দিকে তাকিয়ে কাটাত, নক্ষত্রের নাম লিখে রাখত স্মৃতির চামড়ায়। লোকেরা তাকে ”বলত, “সে আলোর চেয়ে অন্ধকারকে বেশি ভালোবাসে।

এক রাতে, সে যখন এক পুরনো ধ্বংসাবশেষের পাশে বসেছিল, দূরে একটি আলো দেখতে পেল – তা নক্ষত্রের আলো নয়, বরং দুটি চোখের আলো। এক নারীর চোখ, যে একা বসেছিল। সে জায়েদের দিকে তাকিয়ে ছিল যেন তাকে অনন্তকাল ধরে চেনে।

”জায়েদ কাছে এগিয়ে গেলে নারী বলল, “কাছে এসো না। আমি অন্ধকারের জন্য, আর তুমি চাঁদের সন্ধান করছ।

”?জায়েদ বলল, “কে বলেছে অন্ধকার চাঁদকে ভালোবাসতে পারে না

নারীটি হাসল। সেই হাসি ছিল জায়েদের বুকে এক মিষ্টি ছুরির আঘাতের মতো।

সে হল লায়লা। কালো বালির গোত্রের মেয়ে। যে গোত্র নীরবতার উপাসনা করে আর প্রেম নিষিদ্ধ করে। লায়লার সম্মান ছিল তলোয়ারের মতো, তার গলায় বাঁধা। আর জায়েদ ছিল একজন অচেনা – নির্বাসিত, যে ধ্বংসস্তূপের দেয়ালে কবিতা লিখে বেড়ায়।

দ্বিতীয়বার দেখা হলো এক রাতের বাজারে। আলো ছিল ম্লান, বাতাসে মেশানো ছিল আগরবাতির ঘ্রাণ আর বিষাদ।

”?জায়েদ লায়লার কাছে গিয়ে কানে কানে বলল, “কেন মরীচিকার মতো আমার কাছ থেকে পালাও

লায়লা মাথা নেড়ে বলল, “কারণ এখানে প্রেম নিষিদ্ধ। আর তুমি – যদি আমাকে ভালোবাসো, তাহলে তোমার পরিণতি ”হবে চিরস্থায়ী অন্ধকার।

”জায়েদ বলল, “হোক। কারণ ওই অন্ধকারই তো তুমি, হে আমার ছোট চাঁদ।

তারা প্রতিরাতে দেখা করত দূরের আকাশের নিচে, যেখানে গোত্রের চোখ পৌঁছত না। তারা কথা বলত। হাসত। কখনো জায়েদ গান গাইত, আর লায়লা কাঁদত।

এক রাতে জায়েদ লায়লার হাত ধরে তাকে নিয়ে গেল এক পরিত্যক্ত মরুদ্যানে। খেজুর গাছগুলো যেন কিছু কাঁদছিল, আর :পানি চাঁদের আলো প্রতিফলিত করছিল। সেখানে গিয়ে জায়েদ লায়লাকে বলল

আমার প্রিয়, আমি ছায়া নই, আর তুমি শুধু চাঁদও নও। তুমি আমার দেশ। তুমি যদি আকাশ থেকে পড়ে যাও, আমিও“ ”তোমার সাথে জাহান্নামে পড়ে যাব।

”লায়লার চোখ দিয়ে পানি ঝরে পড়ল। সে বলল, “আমার গোত্র যদি জানতে পারে, তারা তোমাকে হত্যা করবে।

”জায়েদ বলল, “তাহলে তারা হত্যা করুক। তোমার সাথে মরাটা তোমার ছাড়া বাঁচার চেয়েও মধুর।

কিন্তু মরুভূমি সবকিছু শুনতে পায়। জায়েদের কথাগুলো বাতাস লায়লার বাবার কানে পৌঁছে দিল। তিনি রেগে গিয়ে লায়লাকে মাটির ঘরে বন্দি করলেন এবং জায়েদকে হত্যার জন্য লোক পাঠালেন।

জায়েদ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেল শান্ত হৃদয়ে। সে জানত, সত্যিকারের প্রেম ক্ষতকে পবিত্র করে। কোনো অলৌকিকভাবে সে বেঁচে গেল, কিন্তু স্মৃতির দৃষ্টি হারালো – শুধু লায়লার নামটি ছাড়া আর কিছুই মনে রাখতে পারল না।

দুই বছর কেটে গেল আগুনের মতো বালির গায়ে।

এক রাতে জায়েদ আবার সেই পুরনো ধ্বংসাবশেষের পাশে বসল, যেখানে তাদের প্রথম দেখা হয়েছিল। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, হঠাৎ অন্ধকারে দুটি চোখ দেখা গেল – সেই একই চোখ।

লায়লা! সে তার বাবার কারাগার থেকে পালিয়েছে।

সে জায়েদের দিকে ছুটে এল, তার বাহুতে পড়ে গেল। তারা কথা বলল না। হাত আর ভালোবাসাই কথা বলল।

মরুভূমির ধারে জায়েদের ছোট্ট ঘরটিতে তারা একটি শান্ত জীবন শুরু করল। তারা তাদের ভালোবাসা লুকিয়ে রাখত ছাইয়ের নিচে আগুনের মতো। কিন্তু বাতাস গোপন রহস্য ফাঁস করে দিল।

একদিন ভোরে গোত্রের লোকজন এসে ঘর ঘিরে ফেলল। মোমবাতি জ্বলছিল, জায়েদ কফি পান করছিল আর লায়লার :চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে বলল

”?তুমি কি আফসোস করো“

লায়লা বলল, “তোমার সাথে যদি একটু রাতও কাটাতাম, তাতে কোনো আফসোস নেই। আর আমার বাবার কারাগারে ”যদি হাজার রাত কাটাতাম, তাতেই আফসোস হতো।

তারপর দরজা জোরে খুলে গেল।

কিন্তু জায়েদ তা আগেই আঁচ করেছিল। ঘরের পিছনে সে একটা ছোট সুড়ঙ্গ খুঁড়ে রেখেছিল – যেখানে শুধু দুটি দেহ মেলে।

”সে লায়লার হাত ধরে ফিসফিস করে বলল, “আমার সাথে পালাও।

তারা পালাল – বালির দমকা হাওয়ার নিচে, গোত্রের ক্রোধের নিচে, চাঁদের চাবুকের নিচে। সেই চাঁদ তাদের দেখেছিল এবং কেবল তাদের জন্যই জ্বলছিল।

তিন দিন পথ চলার পর, তৃষ্ণা আর দৌঁড়ের শেষে তারা পৌঁছল এক দূরবর্তী উপত্যকায়, যেখানে কোনো গোত্রের আওয়াজ পৌঁছায় না। সেখানে ছিল একটি মাত্র গাছ, একটি পুরোনো কুঁড়েঘর আর একটি কূপ।

”?লায়লা জিজ্ঞেস করল, “এটাই কি আমাদের শেষ

জায়েদ বলল, “না, এটাই আমাদের দ্বিতীয় জীবনের শুরু। আমরা এখানে একটি ঘর বানাবো। একটি খেজুর গাছ ”লাগাবো। আর তার নাম দেব লায়লা।

দুই বছরের মধ্যে লায়লা প্রথমবার হাসল। এক হাসি – যা গ্রীষ্মের রাতে মদের চেয়েও মিষ্টি।

গল্প কি শেষ? না, শেষ হয়নি। কারণ যে প্রেম অন্ধকার ভালোবাসে, সে প্রেম কখনো মরে না।

?কিন্তু, হে আমার পাঠক, তুমি কি জানো আসল জায়েদ কে? আর আসল লায়লা কে

আমি জানি। কিন্তু আমি বলব না।

কারণ প্রেম হলো অন্ধকার আর তার চাঁদের গোপন কথা।

আর আমার গোপন কথাটি তোমার সঙ্গেই রইল।

গল্প শেষ

لَيْلَى فِي قَفَصِ الرِّيحِ

كَانَتْ لَيْلَى تُشْبِهُ الرِّيحَ: لا تَسْتَقِرُّ، لا تَتَكَلَّمُ، وَإِذَا أَحَبَّتْ، هَبَّتْ كَالزَّوْبَعَةِ.

وَكَانَ هُوَ، زَايِدٌ، رَجُلاً يَعْشَقُ الْقَفَصَ. لَمْ يَكُنْ قَفَصاً حَدِيدِيّاً، بَلْ قَفَصاً مِنْ كَلِمَاتٍ. كَانَ يَكْتُبُ الشِّعْرَ وَيُغَلِّفُ بِهِ رُوحَهَا، وَهِيَ تَظُنُّ أَنَّ الشِّعْرَ حُرِّيَّةٌ.

يَوْمَ الْتَقَيَا لِلْمَرَّةِ الأُولَى، كَانَتْ لَيْلَى تَرْكُضُ خَلْفَ سَرَابٍ. صَاحَ بِهَا زَايِدٌ: «لِمَ تَجْرِينَ؟ لَيْسَ هُنَاكَ مَاءٌ». الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ وَقَالَتْ: «لَكِنَّ الظَّمْءَ يَجْرِي فِيَّ». ضَحِكَ زَايِدٌ، وَازْدَادَ ظَمَأُ لَيْلَى.

أَحَبَّهَا زَايِدٌ مِنْ أَوَّلِ لَحْظَةٍ، لَكِنَّهُ لَمْ يُخْبِرْهَا. بَدَأَ يَبْنِي لَهَا قَفَصاً. قَفَصاً فِي قَلْبِهِ. فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّحْرَاءِ وَيَنْحَتُ عَلَى الرِّمَالِ: «لَيْلَى... لَيْلَى... لَيْلَى». وَكَانَتِ الرِّيَاحُ تَحْمِلُ الاِسْمَ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ تَرُدُّهُ إِلَيْهِ صَمْتاً.

ذَاتَ يَوْمٍ، وَجَدَتْ لَيْلَى نَفْسَهَا فِي دَاخِلِ قَفَصِهِ. لَمْ تَرَ الْقُضْبَانَ الْحَدِيدِيَّةَ، بَلْ شَعَرَتْ بِأَنَّ كُلَّ طَرِيقٍ تَسْلُكُهُ يُعِيدُهَا إِلَيْهِ. قَالَتْ لِنَفْسِهَا: «أَأَنَا عَاشِقَةٌ أَمْ أَسِيرَةٌ؟»

وَفِي لَيْلَةٍ، جَلَسَا عِنْدَ أَطْلَالٍ قَدِيمَةٍ. كَانَ الْقَمَرُ كَامِلاً، وَالرِّيحُ تَعْزِفُ عَلَى أَوْتَارِ الرَّمْلِ. وَضَعَ زَايِدٌ يَدَهُ عَلَى يَدِهَا وَهَمَسَ: «أَتُحِبِّينَنِي يَا لَيْلَى؟»

صَمَتَتْ طَوِيلاً. ثُمَّ قَالَتْ: «لا أَعْلَمُ. لَكِنِّي أَعْلَمُ أَنِّي كُلَّمَا هَرَبْتُ، وَجَدْتُكَ تَنْتَظِرُنِي عَلَى الْحَافَةِ. كُلَّمَا صَرَخْتُ، سَمِعْتَ صَوْتِي. كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَطِيرَ، شَعَرْتُ بِجَنَاحٍ مَكْسُورٍ».

قَالَ: «اذاً فَأَنَا قَفَصُكِ يَا لَيْلَى».

قَالَتْ: «بَلْ أَنْتَ الْهَوَاءُ الَّذِي لَا أَسْتَطِيعُ الْتِقَاطَ أَنْفَاسِي بِدُونِهِ».

مَرَّتِ السَّنَوَاتُ. كَبِرَتْ لَيْلَى وَكَبِرَ قَفَصُهَا. صَارَتْ تَعْرِفُ كُلَّ شِعْرٍ كَتَبَهُ زَايِدٌ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ. وَصَارَ زَايِدٌ يَعْرِفُ كُلَّ طَرِيقَةٍ تَهْرُبُ بِهَا لَيْلَى وَكَيْفَ يَرُدُّهَا.

لَكِنَّ لَيْلَى كَانَتْ لَيْلَى. وَالرِّيحُ لا تُحَبَسُ إِلَى الأَبَدِ.

ذَاتَ صَبَاحٍ، اسْتَيْقَظَ زَايِدٌ فَلَمْ يَجِدْهَا. كَانَتِ الرِّيَاحُ هَادِئَةً. الْقَفَصُ فَارِغٌ. فَوْقَ الرِّمَالِ، كُتِبَ:

«سَامِحْنِي يَا زَايِدُ. لَقَدْ أَحْبَبْتُكَ حَقّاً، لَكِنَّ الْحُبَّ لا يَعْنِي السِّجْنَ. رِيحٌ أَنَا، وَسَأَظَلُّ رِيحاً. تَذَكَّرْ أَنَّ الْقَفَصَ لَيْسَ وَطَناً، حَتَّى لَوْ كَانَ مِنْ كَلِمَاتٍ.»

قَرَأَ زَايِدٌ الرِّسَالَةَ، وَجَلَسَ سَاكِناً. لَمْ يَبْكِ. لَمْ يَصْرُخْ. بَدَأَ يَكْتُبُ شِعْراً جَدِيداً عَلَى نَفْسِ الرِّمَالِ:

«لَيْلَتِي، لَقَدْ أَطْلَقْتُكِ. لَكِنَّنِي سَأَظَلُّ أَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ، كُلَّمَا هَبَّتِ الرِّيحُ، أَتَخَيَّلُ أَنَّكِ مَنْ تَمُرِّينَ. الْآنَ عَرَفْتُ: أَنَا لَمْ أَحْبِسْكِ يَا لَيْلَى، بَلْ حَبَسْتُ نَفْسِي فِيكِ.»
انْتَهَتِ الْقِصَّةُ؟
فِي الْحَقِيقَةِ، كُلَّمَا هَبَّتِ الرِّيحُ فِي تِلْكَ الصَّحْرَاءِ، يَقُولُ الْبَدْوُ: «أُولَئِكَ لَيْلَى وَزَايِدُ. هُوَ يَكْتُبُ، وَهِيَ تَمُرُّ. وَالْقَفَصُ؟ الْقَفَصُ هُوَ الْعِشْقُ نَفْسُهُ.»

لَيْلَى فِي قَفَصِ الرِّيحِ

বাতাসের খাঁচায় লায়লা

লায়লা ছিল বাতাসের মতো – অস্থির, নিঃশব্দ, আর যখন সে ভালোবাসত, তখন সে ঘূর্ণিঝড় হয়ে বয়ে যেত।
আর সে, জায়েদ, এক ব্যক্তি যে খাঁচাকে ভালোবাসত। তা লোহার খাঁচা ছিল না, বরং শব্দের খাঁচা। সে কবিতা লিখত আর
তাতে জড়িয়ে রাখত লায়লার আত্মাকে। আর লায়লা ভাবত, কবিতা মানেই স্বাধীনতা।
তাদের প্রথম দেখা হয়েছিল একদিন যখন লায়লা মরীচিকার পেছনে দৌড়াচ্ছিল। জায়েদ চিৎকার করে বলল, "কেন
দৌড়াচ্ছ? ওখানে কোনো পানি নেই।" লায়লা ফিরে তাকিয়ে বলল, "তবু তৃষ্ণা আমার ভেতরেই দৌড়ায়।" জায়েদ হেসে
উঠল, আর লায়লার পিপাসা আরও বেড়ে গেল।
জায়েদ প্রথম মুহূর্ত থেকেই লায়লাকে ভালোবেসে ফেলেছিল, কিন্তু তাকে বলেনি। সে তার জন্য একটি খাঁচা তৈরি করতে
শুরু করল – নিজের হৃদয়ের ভেতরে। প্রতি রাতে সে মরুভূমিতে বেরিয়ে বালির ওপর খোদাই করত: "লায়লা…
লায়লা… লায়লা।" আর বাতাসগুলো সে নাম আকাশে নিয়ে যেত, তারপর ফিরিয়ে দিত তাকে – নীরবতা বেয়ে।
একদিন লায়লা নিজেকে জায়েদের খাঁচার ভেতর পেল। লোহার শিক দেখতে পেল না, কিন্তু অনুভব করল – সে যেই পথেই
"?যাক, সব পথ তাকে ফিরিয়ে আনে জায়েদের কাছেই। সে নিজেকে প্রশ্ন করল, "আমি কি প্রেমিকা, নাকি বন্দিনী
এক রাতে তারা পুরনো ধ্বংসাবশেষের ধারে বসেছিল। চাঁদ ছিল পূর্ণ, বাতাস বাজাচ্ছিল বালির তারে। জায়েদ তার হাতের
"?ওপর হাত রেখে ফিসফিস করে বলল, "তুমি কি আমাকে ভালোবাসো, লায়লা
লায়লা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, "জানি না। তবে আমি এতটুকু জানি – যখনই পালাই, দেখি তুমি প্রান্তরে
দাঁড়িয়ে আছ। যখনই চিৎকার করি, তুমি আমার আওয়াজ শুনতে পাও। যখনই উড়তে চাই, অনুভব করি আমার একটি
"ডানা ভাঙা।
"জায়েদ বলল, "তাহলে আমি তোমার খাঁচা, লায়লা।
"লায়লা বলল, "বরং তুমি সেই বাতাস, যা ছাড়া আমি নিঃশ্বাস নিতে পারি না।
বছর কেটে গেল। লায়লা বড় হলো, তার খাঁচাও বড় হলো। জায়েদের লেখা সব কবিতা সে এখন হৃদয়স্থ করতে পারত।
আর জায়েদ জানতে পারল লায়লা কোন পথে পালাতে চায় আর কীভাবে তাকে ফিরিয়ে আনা যায়।
কিন্তু লায়লা তো লায়লা। বাতাস চিরকাল বন্দি থাকে না।
:এক সকালে জায়েদ ঘুম ভাঙিয়ে দেখল লায়লা নেই। বাতাস তখন স্তব্ধ। খাঁচা ফাঁকা। বালির ওপর লেখা ছিল
আমাকে ক্ষমা করো, জায়েদ। আমি তোমাকে সত্যিই ভালোবেসেছিলাম। কিন্তু ভালোবাসা মানে কারাগার নয়। আমি"
"বাতাস, আর বাতাসই হয়ে থাকব। মনে রেখো, খাঁচা কখনো ঘর হয় না – এমনকি যদি তা শব্দেরও হয়।

জায়েদ বার্তাটি পড়ল। চুপ করে বসে রইল। কাঁদল না। চিৎকার করল না। বরং সেই বালির ওপরেই নতুন এক কবিতা :লিখতে শুরু করল

হে আমার রাত, আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। কিন্তু আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকব – যখনই বাতাস বইবে, ভাবব“ তুমিই পার হয়ে যাচ্ছ। এখন বুঝেছি: আমি তোমাকে বন্দি করিনি, লায়লা, বরং তোমার ভেতরেই নিজেকে বন্দি ”করেছিলাম।

?গল্প কি শেষ

আসল ব্যাপার হলো, সেই মরুভূমিতে যখনই বাতাস বয়, বেদুইনরা বলে, “ওই ওা] লায়লা আর জায়েদ। সে লেখে, আর ”সে বয়ে যায়। আর খাঁচাটা? খাঁচাটা হলো ভালোবাসাটাই।

বাতাসের প্রতিধ্বনিতে গল্প শেষ

رَمْلٌ يَبْكِي فِرَاقَ النَّجْمِ

বালি কাঁদে তারকার বিচ্ছেদে

মরুভূমির বুকে এক যুবক বাস করত। তার নাম জায়েদ। সে এমন ছিল – দিনের বেলা মানুষদের মাঝে পথ হারাত, কিন্তু রাত নামলেই একা একা চলে যেত বালির এক টিলায়। সেটা ছিল তার জান্নাত আর জাহান্নামের মাঝামাঝি জায়গা। সেখানে গিয়ে সে মুখ তুলে তাকাত আকাশের দিকে। তার চোখ খুঁজে নিত একটি নির্দিষ্ট নক্ষত্রকে, যাকে সে ডাকত "নজমা" – মানে আমার ছোট্ট তারা।

নজমার সঙ্গে জায়েদের অলিখিত চুক্তি ছিল। সে বিশ্বাস করত, সে নক্ষত্রটি শুধু তার জন্যই জ্বলে। অন্যান্য মানুষের চোখে যেটা নিঃসঙ্গ শুভ্র আলোর বিন্দু, জায়েদের চোখে সেটা ছিল প্রেমিকের বিবর্ণ মুখ। সে রাতে তারার সঙ্গে কথা বলত, গল্প বলত, কখনো অভিমান করত। আর নক্ষত্রটি ঝিকিমিকি করে উত্তর দিত – ভাষাহীন, তবু বোধগম্য।

একদিন রাতে জায়েদ বালির টিলায় বসে ফিসফিস করে বলল – "ওগো নজমা, ওপার থেকে দেখ, আমি কি খুব ছোট? তুই কি আমার যন্ত্রণা দেখিস? নাকি খুব উঁচুতে বলে চোখে ধুলো পড়ে গেছে তোর?" নক্ষত্রটি জ্বলে উঠল একটু বেশি। জায়েদ ভাবল, এ যেন প্রিয়ার দূর থেকে ফেলা নজর।
কিন্তু সেই রাতেই ভয়ংকর ব্যাপার ঘটল। জায়েদ যখন চোখ মেলে, দেখল তার নজমা নেই! আকাশের সে জায়গাটা ফাঁকা। সেখানে একটি শূন্য কালো গহ্বর যেন হাঁ করছে। জায়েদের বুক ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সে জানত না, নক্ষত্রাও মরে, নক্ষত্রেও বিদায় নেয়।
সে রাতে জায়েদ প্রথমবারের মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে কাঁদেনি; সে চিৎকার করেছিল। চিৎকার বালির গায়ে গিয়ে ঠেকত, ফিরে আসত নিজের কানেই – ধ্বসে পড়া প্রাচীরের প্রতিধ্বনির মতো। বালি তখনও নীরব। কিন্তু জায়েদের চোখের পানি যখন গড়িয়ে পড়ল তার ওপর, বালি যেন প্রথমবার অস্থির হলো। সে জল শুষে নিল ক্ষুধার্ত চামড়ার মতো, কিন্তু সেই শুষে নেওয়ার ভেতর ছিল এক কান্না – তপ্ত দিনের বালি যখন বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা পায়, তখন যেভাবে কেঁপে ওঠে, সেভাবেই কেঁপে উঠল সে টিলা।
তখনই জায়েদ দেখল – দূর থেকে এক নারী আসছে। সাদা পোশাক, পা দুটি বালি স্পর্শ করছে না। পৃথিবীর কোনো নারীর মতো নয় সে। কাছে এলে তার চোখ দুটি দেখা গেল – আকাশের নীল যেন ছুঁই ছুঁই, ভেতরে জ্বলছে এক শীতল আলো।
নারীটি থামল জায়েদের সামনে। তার কন্ঠ কাঁচের মতো পরিষ্কার, তবু করুণ – "কাঁদছ কেন, জায়েদ?"
জায়েদ বলল, "আমার তারা হারিয়ে গেছে।"
নারীটি হাসল। সেই হাসির ভেতর ছিল চাঁদের আলোর মতো এক বিষাদ। বলল, "আমিই তোমার তারা। নাম নজমা। আমি আকাশ ছেড়ে নেমে এসেছি, শেষবার তোমাকে দেখতে।"
জায়েদ প্রথমে বিশ্বাস করতে চাইল না। কিন্তু সে নারীর গায়ের আলো দেখল, তার চুলে ছড়ানো নক্ষত্রের ধুলো দেখল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "তবে কি তুই আমার নজমা? যে প্রতিরাতে আমার গল্প শুনত?"
নারীর চোখ ভিজে গেল। বলল, "হ্যাঁ। আকাশ থেকে তোমার কান্না দেখে আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। ফেরেশতারা নিষেধ করেছিল, কিন্তু আমি শুনিনি। নেমে এসেছি – এক রাতের জন্য।"
জায়েদের বুক তখন ভারী হয়ে উঠল সুখে আর যন্ত্রণায়। সে বলল, "তাইলে তুই থাকবি না?"
নজমা মাথা নিচু করল। বলল, "ভোর হলেই ফিরে যেতে হবে। হবে খুব সকালে, পাখির প্রথম ডাকের আগে। আর ফিরলে আর নামতে পারব না। একবারের জন্যই অনুমতি পেয়েছি।"
সেই রাত যেন এক ঘূর্ণাবর্ত। জায়েদ নজমার হাত ধরে বসল। কথা বলল। বলল তার মায়ের কথা, মরুভূমির নির্জনতার কথা, সেই সব রাতের কথা যখন সে একা ছিল আর একা থাকার যন্ত্রণা তাকে নক্ষত্র প্রেমিক বানিয়েছিল। নজমা শুনল। কখনো হাসল, কখনো জায়েদের চুলে হাত বুলাল। তার স্পর্শ ছিল বাতাসের মতো – টের পাওয়া যায়, কিন্তু ধরা যায় না।
রাত যখন অর্ধেক, জায়েদ হঠাৎ থেমে গেল। যেন স্কন্ধ থেকে বোঝা নেমেছে। চোখে নির্ঘুম ক্লান্তি, তবু তার ভেতর এক অদ্ভুত শান্তি। সে বলল, "তুই না থাকবি তো আমি কী করব? কাকে বলব গল্প? কাকে বকবক করব মাঝরাতে?"
নজমা বলল, "আমাকে দেখবি আকাশে। আমি আবার জ্বলব তোমার জন্যেই। কিন্তু দূর থেকে। তখন তুই বালির ওপর চোখ রেখে শুয়ে থাকবি, আর আমি রোজ রাতে তোরই দিকে মুখ করে জ্বলব। এটাই আমাদের প্রেম হবে – পলাতক চাঁদ ও তার পাগল প্রেমিকের গল্প।"
ভোর হতে বাকি এক প্রহর। তখন নজমা উঠে দাঁড়াল। জায়েদ জানত, বারবার বলার দরকার নেই। সে কেবল বলল, "একটা কথা বলবি?" নজমা বলল, "বল।" জায়েদ বলল, "আমার নাম কি ভুলে যাবি?" নজমা বলল, "আমি নক্ষত্র। আমি কখনও ভুলি না। শুধু শেষ হয়ে যাই, কিন্তু ভোলা আমার স্বভাব নয়।"
তারপর নজমা উঠে গেল আকাশের দিকে। প্রথমে সাদা পোশাকটি আলোয় মিলিয়ে গেল, তারপর হাত, তারপর মুখ। জায়েদ দেখল সে আবার ফিরে গেল সেই একই জায়গায় – যেখানে কাল রাত পর্যন্ত তার নক্ষত্র ছিল না।

হঠাৎ সেখানে এক ঝলকানি! নজমা জ্বলে উঠল। কিন্তু এবার তার আলো আগের চেয়ে কম, যেন ক্লান্ত। জায়েদ বুঝল, প্রেম নামার ব্যাপারটাই নক্ষত্রকে ক্লান্ত করে।
সে সকালে জায়েদ বালি টিলায় খুব দীর্ঘশ্বাস ফেলল। দীর্ঘশ্বাসের ঝাপটা বালির ওপর দাগ কেটে গেল – হৃদয়ের মতো একটা আঁকাবাঁকা রেখা। ঐ রেখা থেকে জন্ম নিল এক ছোট গাছ। মরুভূমির বুকে একা দাঁড়িয়ে থাকা এক কান্নাকাটি কাঁটাগাছ। বেদুইনরা পরে নাম দিয়েছিল ‘শজরাতু লাইল’ – রাতের গাছ। কারণ শুধু রাতেই তার ডালপালা কাঁদত, ঝরিয়ে দিত শিশিরের ফোঁটা আর সেই ফোঁটায় জ্বলত নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব।
জায়েদ সেদিন থেকে আর আগের মতো ছিল না। সে কথা বলা ছেড়ে দিল। শুধু হাতের ইশারায় সব বোঝাত। তার চোখ সব সময় আকাশের ঐ অংশটুকু দেখত। আর তার হাতের আঙুলের ডগা সবসময় আঁকত বালিতে – একটি নক্ষত্র। তাতে প্রতিদিন রাতের বাতাস মুছে দিত। প্রতিদিন জায়েদ আবার আঁকত। বালি আর বাতাসের এই খেলা দেখে লোকেরা বলত – ওই যে পাগল বালির ওপর তারা আঁকে, যেন কেউ বুঝি আসবে তাকে নিয়ে যেতে।
একদিন সে আঁকা থামিয়ে দিল। বেদুইনরা দেখল, জায়েদ বালির ওপর শুয়ে পড়েছে। তার চোখ খোলা, ডান হাত আকাশের দিকে ওঠানো। তার মুখে অদ্ভুত এক শান্তির ছাপ। কেউ জানত না সে মৃত নাকি স্বপ্নে বিভোর। একজন বুড়ি কাছে গিয়ে তার গায়ে হাত রাখল। বুড়ি কেঁদে ফেলল। সে বলল, "এই শরীর পৃথিবীর, কিন্তু আত্মাটা ইতিমধ্যেই ফিরে গেছে আকাশে।"
বেদুইনরা তাকে সেই একই টিলায় পুঁতে দিল – যেখানে নজমা এসেছিল, যেখানে প্রথম কান্না হয়েছিল, যেখানে বালি আর্দ্র হয়ে গিয়েছিল। তারা মাটি চাপা দিতে গিয়ে দেখল, গর্তের ভেতর বালি শুকনো নয়, বরং স্যাঁতসেঁতে – যেন পৃথিবী নিজেই কাঁদছে।
তারপর থেকে প্রতি রাতে সেই টিলার ওপর আকাশে দুটি তারা জ্বলতে শুরু করল। আগে ছিল একটি, এখন দুটি। একটি নীলাভ সাদা – নজমা। অপরটি লালচে কমলা – জায়েদ। বেদুইন মায়েরা শিশুদের ঘুম পাড়াতে এখন গান গায়:
"বালি কেঁদেছিল খোলা মাঠে,
শুনে তারার ব্যথা রাতে।
তারা নামল তৃষ্ণা মেটাতে,
শেষে ফিরে গেল আপন পাতাতে।
প্রেমিক রইল বালির গায়ে,
এখন দুই তারা আকাশে হায়!"
আজও যদি কে� ওই মরুভূমির ওই টিলার বালি হাতে নেয়, সে অনুভব করবে এক অদ্ভুত স্নিগ্ধতা। সে স্নিগ্ধতা পানি নয়, তেল নয়, বরং একটি নক্ষত্রের বিদায়ী দৃষ্টি আর এক পাগল প্রেমিকের শেষ নিঃশ্বাসের মিশেল। বালি এখনও কাঁদে – নজমার বিচ্ছেদে নয়, বরং সে প্রেমের জন্য যা এই পৃথিবীতে স্থায়ী হয় না, তবু প্রতিটি রাতে আকাশ থেকে ঝরে পড়ে কোনো না কোনো বেদনার আলো।

গল্প শেষ।

وَعْدُ الرَّمَادِ

تَأْلِيفُ: مَوْلَانَا أَشْرَفُ الإِسْلَامِ دَهَانْكُوشَا

فِي قَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ عَلَى حَافَّةِ الصَّحْرَاءِ، كَانَتْ هُنَاكَ بَيْتٌ مِنْ طِينٍ، وَفِي ذَلِكَ الْبَيْتِ كَانَتْ تَعِيشُ فَتَاةٌ اسْمُهَا نَجْوَى. كَانَتْ نَجْوَى جَمِيلَةً كَالْقَمَرِ لَكِنَّهَا حَزِينَةٌ كَالْمَطَرِ الَّذِي لَا يَنْزِلُ.

وَكَانَ فِي نَفْسِ الْقَرْيَةِ شَابٌّ اسْمُهُ سَيْفٌ. كَانَ سَيْفٌ يُحِبُّ النَّارَ. لَيْسَ النَّارَ الَّتِي تَأْكُلُ الْحَطَبَ، بَلِ النَّارَ الَّتِي تَأْكُلُ الْقُلُوبَ.

يَوْمَ الْتَقَيَا، كَانَ الْهَوَاءُ حَارّاً، وَالسَّمَاءُ تَغْبَرُّ. قَالَتْ نَجْوَى: «لِمَ تَنْظُرُ إِلَيَّ هَكَذَا؟» قَالَ سَيْفٌ: «لِأَنَّ عَيْنَيْكِ تُشْبِهَانِ الرَّمَادَ الَّذِي لَا يَمُوتُ». لَمْ تَفْهَمْ نَجْوَى مَا يَقُولُ، لَكِنَّهَا أَحَسَّتْ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ سَيُغَيِّرُ حَيَاتَهَا.

بَدَأَ سَيْفٌ يَزُورُهَا كُلَّ لَيْلَةٍ. كَانَ يَأْتِي مِنْ خِلَالِ النَّافِذَةِ، لَا مِنَ الْبَابِ. كَانَ يَقُولُ لَهَا: «أَنَا رَجُلٌ مَحْرُوقٌ، يَا نَجْوَى. حَرَقَتْنِي الْحَيَاةُ، وَلَمْ يَبْقَ مِنِّي إِلَّا الرَّمَادُ. هَلْ تُحِبِّينَ الرَّمَادَ؟»

كَانَتْ نَجْوَى تَضْحَكُ: «الرَّمَادُ يَحْمِلُ الْأَسْرَارَ، وَأَنَا أُحِبُّ الْأَسْرَارَ».

مَرَّتْ أَيَّامٌ وَكَانَ الْحُبُّ يَزْدَادُ كَالنَّارِ فِي الْحَطَبِ الْيَابِسِ. لَكِنَّ أَهْلَ نَجْوَى عَرَفُوا بِالْأَمْرِ. كَانَ أَبُوهَا رَجُلاً غَضُوباً. قَالَ لَهَا: «سَيْفٌ لَيْسَ ابْنَ قَبِيلَتِنَا. سَيْفٌ غَرِيبٌ. إِنْ أَحْبَبْتِيهِ فَسَأَحْبِسُكِ فِي الْغُرْفَةِ حَتَّى تَنْسَيْهِ».

لَمْ تَنْسَهُ. بَلْ ازْدَادَتْ حُبّاً.

فِي لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الظُّلْمَةِ، جَاءَ سَيْفٌ إِلَى النَّافِذَةِ، وَكَانَتْ يَدُهُ تَنْزِفُ. قَالَ: «ضَرَبُونِي، لَكِنِّي جِئْتُ. هَلْ تَأْتِينَ مَعِي؟»

نَظَرَتْ نَجْوَى إِلَى الْبَابِ الْمَقْفُولِ، ثُمَّ إِلَى سَيْفٍ. هَمَسَتْ: «أَيْنَ نَذْهَبُ؟»

قَالَ: «إِلَى حَيْثُ لَا يَجِدُنَا أَحَدٌ. إِلَى الصَّحْرَاءِ. إِلَى بَيْتٍ بَنَيْتُهُ بِرَاحَتِي. سَنَعِيشُ هُنَاكَ، نَحْنُ وَالرَّمَادُ الَّذِي نَحْنُ صَنَعْنَاهُ».

هَرَبَتْ مَعَهُ. مَشَيَا طَوِيلاً. كَانَتِ الرِّمَالُ تَئِنُّ تَحْتَ أَقْدَامِهِمَا. وَكَانَ الْقَمَرُ شَاهِداً وَحِيداً.
وَجَدَا الْبَيْتَ. كَانَ صَغِيراً، أَسْوَدَ – مَبْنِياً مِنَ الْحِجَارَةِ التِي سَوَّدَتْهَا النَّارُ قَدِيماً. دَخَلَا. أَضَاءَ سَيْفٌ شَمْعَةً وَاحِدَةً. فَسَقَطَ الظِّلُّ عَلَى الْحَائِطِ كَشَيْطَانٍ يَرْقُصُ.
قَالَتْ نَجْوَى: «لَيْسَ هُنَا أَثَاثٌ. كَيْفَ سَنَعِيشُ؟»
قَالَ سَيْفٌ: «سَنَعِيشُ عَلَى الْحُبِّ. الحُبُّ أَثَاثٌ أَحْيَاناً».
لَكِنَّ الْحُبَّ لَمْ يَكُنْ كَافِياً. بَعْدَ شَهْرَيْنِ، بَدَأَ سَيْفٌ يَتَغَيَّرُ. صَارَ يَصْمُتُ طَوِيلاً. وَكَانَ أَحْيَاناً يَنْظُرُ إِلَى نَجْوَى كَأَنَّهَا عَدُوَّةٌ. وَفِي لَيْلَةٍ، صَرَخَ فِي وَجْهِهَا: «أَنْتِ سَبَبُ أَلَمِي! لَوْلا أَنْتِ، لَمَا تَرَكْتُ قَبِيلَتِي، وَلَمَا صِرْتُ هَذَا الإِنْسَانَ الْفَقِيرَ!»
بَكَتْ نَجْوَى. لَكِنَّهَا تَذَكَّرَتْ مَا قَالَ لَهَا يَوْماً: «الرَّمَادُ يَحْمِلُ الْأَسْرَارَ». لَعَلَّ سِرَّ سَيْفٍ هُوَ أَنَّهُ كَانَ خَائِفاً مِنَ الْوَحْدَةِ، لَا مِنَ الْحُبِّ.
ذَاتَ صَبَاحٍ، اسْتَيْقَظَتْ نَجْوَى فَلَمْ تَجِدْ سَيْفاً. وَجَدَتْ قِطْعَةً مِنَ الْوَرَقِ مَكْتُوباً فِيهَا:
«يَا نَجْوَى، غَادَرْتُ لِأَنَّ الحُبَّ الَّذِي بَدَأَ بِالنَّارِ لَا يَنْتَهِي إِلَّا بِالرَّمَادِ. وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ رَمَادٍ. لَا تَبْكِي عَلَيَّ. بَلْ أُحْرِقِي هَذِهِ الْوَرَقَةَ، وَوَعْدِي لَكِ أَنَّنِي سَأَرْجِعُ يَوْماً، عِنْدَمَا يَنْسَى الْقَمَرُ مُحَاسَبَةَ الْعُشَّاقِ.»
قَرَأَتْ نَجْوَى الْكَلِمَاتِ ثُمَّ أَحْرَقَتِ الْوَرَقَةَ. تَحَوَّلَتْ إِلَى رَمَادٍ أَسْوَدَ. حَفِظَتْ ذَلِكَ الرَّمَادَ فِي زُجَاجَةٍ صَغِيرَةٍ، وَعَلَّقَتْهَا فِي عُنُقِهَا.
قَضَتْ نَجْوَى ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ تَنْتَظِرُ. كُلَّ لَيْلَةٍ، كَانَتْ تَخْرُجُ إِلَى بَابِ الْبَيْتِ الصَّغِيرِ، وَتَنْظُرُ إِلَى الصَّحْرَاءِ، لَعَلَّ نُقْطَةً سَوْدَاءَ تَظْهَرُ. لَمْ تَظْهَرْ.
فِي كُلِّ يَوْمٍ، كَانَتْ تَفْتَحُ الزُّجَاجَةَ، وَتَشَمُّ رَائِحَةَ الرَّمَادِ. كَانَتْ تَذْكُرُ كَلِمَةَ سَيْفٍ: «وَعْدِي لَكِ». وَكَانَتْ تَعِيشُ عَلَى ذَلِكَ الْوَعْدِ كَمَا يَعِيشُ الظَّمْآنُ عَلَى السَّرَابِ.
ثُمَّ فِي لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِي، هَبَّتْ رِيحٌ قَوِيَّةٌ. طَارَتِ الزُّجَاجَةُ مِنْ عُنُقِ نَجْوَى وَتَحَطَّمَتْ عَلَى الْأَرْضِ. تَنَاثَرَ الرَّمَادُ فِي الْهَوَاءِ. بَكَتْ نَجْوَى كَثِيراً، لَكِنَّ الرِّيحَ لَمْ تَرُدَّ الرَّمَادَ.

وَفِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، رَأَتْ فِي الْمَنَامِ شَيْخاً عَجُوزاً يَقُولُ لَهَا: «يَا نَجْوَى، الْوَعْدُ إِذَا صَارَ رَمَاداً، فَاعْلَمِي أَنَّ صَاحِبَهُ مَاتَ. سَيْفٌ مَاتَ بَعْدَ شَهْرٍ وَاحِدٍ مِنْ رَحِيلِهِ. جِسْمُهُ فِي الصَّحْرَاءِ، وَرُوحُهُ لَمْ تَجِدِ الطَّرِيقَ إِلَيْكِ. الْآنَ حُرِّرِي نَفْسَكِ فَلَا تَعِيشِي لِلرَّمَادِ.»

اسْتَيْقَظَتْ نَجْوَى فَزِعَةً. دَمَّعَتْ عَيْنَاهَا، لَكِنَّهَا لَمْ تَبْكِ. قَامَتْ، جَمَعَتْ مَا تَبَقَّى مِنَ الرَّمَادِ عَلَى الْأَرْضِ، وَدَفَنَتْهُ تَحْتَ شَجَرَةِ السَّمُرِ الْوَحِيدَةِ فِي الْجِوَارِ. كَتَبَتْ عَلَى الْحِجَارَةِ:

«هُنَا دُفِنَ وَعْدٌ خَانَهُ الْعَاشِقُ. تُرْحَمُ الرُّوحُ الَّتِي خَرَجَتْ مِنَ النَّارِ إِلَى الرَّمَادِ.»

ثُمَّ جَلَسَتْ نَجْوَى تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَأَخَذَتْ تَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ. فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، كَانَتِ السَّمَاءُ مُمْطِرَةً بِالنِّيَاطِ. سَقَطَ الْمَطَرُ عَلَى التُّرَابِ، فَخَلَطَ دُمُوعَهَا بِدُمُوعِ السَّحَابِ.

مَا زَالَتْ نَجْوَى حَيَّةً، وَلَمْ تَتَزَوَّجْ بَعْدَ سَيْفٍ. كَبِرَتْ وَصَارَتِ امْرَأَةً عَجُوزاً، تَجْلِسُ كُلَّ لَيْلَةٍ تَحْتَ شَجَرَةِ السَّمُرِ، تَنْظُرُ إِلَى الصَّحْرَاءِ كَأَنَّهَا تَنْتَظِرُ. يَسْأَلُهَا النَّاسُ: «أَتَنْتَظِرِينَ سَيْفاً بَعْدَ كُلِّ هَذِهِ السِّنِينَ؟»

فَتَضْحَكُ وَتَقُولُ: «لا، لَسْتُ أَنْتَظِرُ سَيْفاً. أَنَا أَنْتَظِرُ الرَّمَادَ الَّذِي عِشْتُ فِيهِ. لِأَنَّ الرَّمَادَ، يَا صَدِيقِي، لَيْسَ نِهَايَةَ النَّارِ، بَلْ مَوْعِدَ نِهَايَتِهَا. وَكُلُّ نِهَايَةٍ تَحْمِلُ فِي جَوْفِهَا وَعْدَ بِدَايَةٍ جَدِيدَةٍ – وَلَوْ كَانَتِ الْبِدَايَةُ دَمْعَةً فَقَطْ.»

يُرْوَى أَنَّ الْبَدْوَ إِذَا مَرُّوا بِذَلِكَ الْمَكَانِ، مَا زَالُوا يَرَوْنَ الزُّجَاجَةَ الْمُحَطَّمَةَ قُرْبَ شَجَرَةِ السَّمُرِ، وَالْحِجَارَةَ الْمَكْتُوبَ عَلَيْهَا تَذْبُلُ فِي الشَّمْسِ. وَعَلَى الرَّمْلِ كُلَّ صَبَاحٍ، يَجِدُونَ أَثَرَ جُلُوسِ نَجْوَى، بَيْنَ الدَّمْعَةِ وَالدَّمْعَةِ، بَيْنَ الْوَعْدِ الَّذِي مَاتَ وَالْوَعْدِ الَّذِي لَا يَزَالُ يُعَلِّمُ الْعُشَّاقَ كَيْفَ يَحْتَرِقُونَ حَتَّى لَا يَخْشَوْنَ الرَّمَادَ.

انتهت القصة

وَعْدُ الرَّمَادِ

ছাইয়ের প্রতিশ্রুতি

মরুভূমির কিনারায় একটি ছোট গ্রাম। সেখানে কাদামাটির এক ঘর। সেই ঘরে বাস করত নাজওয়া নামের এক তরুণী। সে ছিল চাঁদের মতো সুন্দর, কিন্তু তার চোখে সারাক্ষণ বিষাদের বাসা – বৃষ্টির মতো যে কখনো নামে না, শুধু মেঘের ভেতর বন্দি থাকে।
একই গ্রামে ছিল সাইফ। পোড়া চেহারার এক যুবক। সাইফ আগুনকে ভালোবাসত – কাঠপোড়ানো আগুন নয়, বরং সেই আগুন যা মানুষের ভেতর লুকিয়ে থাকে, যা হৃদয় গ্রাস করে নেয় ধীরে ধীরে, কীটপতঙ্গের মতো নীরবে।

প্রথম দেখা

পৃথিবীর সব গল্প শুরু হয় কোনো না কোনো দুপুরে, যে দুপুরে বাতাস দাঁড়িয়ে যায় থমকে। নাজওয়া আর সাইফের প্রথম দেখা সেদিন হঠাৎ করেই ঘটল। বাতাস ছিল তপ্ত, আকাশে ধোঁয়ার মতো মেঘ। নাজওয়া জিজ্ঞেস করল, “এভাবে কেন তাকিয়ে আছ?” সাইফ বলল, “তোমার চোখ ছাইয়ের মতো – যে ছাই কখনো পুরোপুরি মরে না, ভেতরে এখনও আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে।” নাজওয়া বুঝতে পারল না সে কী বলছে, কিন্তু টের পেল – এই মানুষটি তার নিয়তি বদলে দেবে।

চুরি যাওয়া দেখা

তারপর থেকে সাইফ প্রতিরাতে আসতে লাগল। সে কখনো দরজা দিয়ে আসত না; জানালা বেয়ে চুপিসারে ঢুকত – বাদুড়ের মতো, না, বরং চোরের মতো যে চুরি করে মানুষজনের স্বপ্ন। সে বলত, “আমি পোড়া মানুষ, নাজওয়া। জীবন আমাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। তুই কি ছাইকে ভালোবাসতে পারিস?” নাজওয়া হাসত, বালিশের আড়ালে মুখ লুকিয়ে বলত, “ছাই সব সময় কিছু না কিছু গোপন রেখে দেয়। আর আমি গোপন কথা ”ভালোবাসি।
আগুন শুকনো কাঠের মতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। তাদের প্রেম গ্রামের চোখ ফাঁকি দিল না। নাজওয়ার বাবা জানতে পেরে রাগে ফেটে পড়লেন। তিনি বললেন, “সাইফ আমাদের গোত্রের নয়। সে পরকীয়া। তুই যদি ওকে ”ভালোবাসিস, তাহলে তোকে ঘরবন্দি করে রাখব – যত দিন না ভুলে যাস।
কিন্তু নাজওয়া ভুলল না। বরং ভালোবাসা ভেতরে শিকড় ছাড়ল – অন্ধকার বীজের মতো, যে বীজ মাটিচাপা পড়েও ওপরে ওঠে।

পলায়ন

এক ঘোর অন্ধকার রাতে সাইফ এল জানালা দিয়ে। তার হাত থেকে রক্ত ঝরছিল। চুপিসারে বলল, “আমাকে মেরেছে। তবু এলাম। তুই কি আমার সঙ্গে আসবি?” নাজওয়া পিছন ফিরে তাকাল – তালাবদ্ধ দরজার দিকে, ”?তারপর সাইফের দিকে। কাঁপা গলায় বলল, “কোথায় যাব
সাইফ বলল, “যেখানে কেউ পাবে না আমাদের। মরুভূমির ভেতর। আমি একটা ঘর বানিয়েছি নিজের হাতে। ”থাকব সেখানে – আমরা আর আমাদের পোড়া সমস্ত কিছু।
রাত শেষে তারা পালাল। বালির বুকে পা রেখে হাঁটতে হাঁটতে তাদের পায়ের চিহ্ন হতে থাকল – যেন পৃথিবীর বুকে আঁকা এক প্রেমের স্বাক্ষর। চাঁদ ছিল একমাত্র সাক্ষী।

ছাইয়ের ঘর

ঘরটি পেল। ছোট, কালো – আগুনে কালো হয়ে যাওয়া পাথর দিয়ে বানানো। সাইফ একটি মোমবাতি জ্বালাল। দেওয়ালে ছায়া নেচে উঠল – পিশাচের মতো না, বরং পোড়া মানুষের স্বপ্নের মতো। নাজওয়া বলল, "এখানে কোনো আসবাব নেই। কীভাবে থাকব?" সাইফ বলল, "ভালোবাসাই আসবাব। অনেক সময় ভালোবাসাই ”যথেষ্ট।

কিন্তু ভালোবাসা যথেষ্ট ছিল না। দুই মাস পর বদলে যেতে লাগল সাইফ। আগের মানুষটি যেন কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে থাকত, নাজওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকত – শিকারের দিকে সাপের চোখের মতো। একরাতে চিৎকার করে উঠল, "তু-ই আমার কষ্টের কারণ! তোর জন্যই ঘর ছেড়েছি, গোত্র ”!ছেড়েছি, এখন এই দশা

নাজওয়া কাঁদল। কিন্তু সেদিনের কথা মনে পড়ল – ছাই সবসময় গোপন রাখে। নিশ্চয় সাইফের ভেতরেও লুকিয়ে আছে কিছু গোপন। হয়তো সে ভালোবাসাকে ভয় পায় না, বরং একা হয়ে যাওয়াকে ভয় পায়।

প্রতিশ্রুতি আর পালানো

এক সকালে নাজওয়া চোখ মেলেই দেখল সাইফ নেই। বিছানা ফাঁকা। তার জায়গায় শুধু কাগজের টুকরো – :যেন মৃত্যুর দূত রেখে গেছে ডাকঘরের টিকিট। কাগজে লেখা

নাজওয়া, চলে গেলাম। কারণ যে প্রেম আগুন দিয়ে শুরু, তার শেষ ছাই। আর আমি তো ছাইয়ের মানুষ।" আমার জন্য কেঁদো না। এই কাগজখানা পুড়িয়ে দিও। আর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি – আমি ফিরব একদিন, ওই দিন ”যখন চাঁদ আর প্রেমিকদের হিসাব নিতে ভুলে যাবে।

নাজওয়া কাগজটা পড়ল। তারপর পুড়িয়ে ফেলল। কাগজ হয়ে গেল ছাই – ছাইভস্ম। সে সেই ছাই ভরে রাখল ছোট্ট একটি কাচের শিশিতে, গলায় বাঁধল। সেটা হয়ে গেল তার অলঙ্কার – অন্ধকারে ঝলমলানো এক মরণের নিদর্শন।

অপেক্ষার কাল

সেই ছাই বুকের কাছে রেখে নাজওয়া কাটিয়ে দিল তিন বছর। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াত – চোখ রাখত মরুভূমির দূর প্রান্তে, হয়তো কোথায় কালো বিন্দু দেখা যাবে। বিন্দু দেখা যায়নি কখনো। প্রতিদিন শিশিটি খুলত, ছাইয়ের গন্ধ নিত। নাক ভরিয়ে দিত আগুন আর বিচ্ছেদের মিষ্টি গন্ধে। সাইফের ”...কথাগুলো বালির দানার মতো গুনে গুনে ফেলত: "প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি... ফিরব... চাঁদ যেদিন ভুলে যাবে

একদিন এক ভয়াবহ রাতে বাতাস এল – ক্ষিপ্ত সিংহের মতো। শিশিটি উড়ে গেল নাজওয়ার গলা থেকে, মাটিতে পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ। ছাই ছড়িয়ে গেল আকাশে – খুদে খুদে রূপকণার মতো, কোনো মায়াবী ফেরেশতার ডানার পরাগরেণু। নাজওয়া অনেক কাঁদল। কিন্তু বাতাস কিছুতেই ছাই ফিরিয়ে দিল না।

স্বপ্নের সত্যতা

সেই রাতে দেখল এক স্বপ্ন। এক বুড়ো শায়খ এসে বললেন, "নাজওয়া, প্রতিশ্রুতি যখন ছাই হয়ে যায়, জেনো – ওই প্রতিশ্রুতি দাতা আর নেই। সাইফ চলে যাওয়ার এক মাসের মাথায় মারা গেছে। তার শরীর পড়ে আছে মরুভূমির কোথাও, আর আত্মা পথ পায়নি তোমার কাছে। এখন তুমি নিজেকে ছাড়িয়ে দাও। ছাইয়ের জন্য ”বাঁচো না।

নাজওয়া স্বপ্ন ভাঙিয়ে চমকে উঠল। চোখের পাতা ভিজে গেল, কিন্তু চোখ দিয়ে পানি নামল না। সে উঠে মাটি থেকে ছাইয়ের কিছু অংশ কুড়িয়ে নিল, আর পুঁতে দিল একা একা দাঁড়িয়ে থাকা বাবলা গাছের তলায়। পাথরে :খোদাই করে লিখল

এখানে পুঁতে রাখা হলো এক প্রতিশ্রুতি – প্রেমিক যাকে রেখে গিয়েও রাখতে পারেনি। পোড়া আত্মার প্রতি দয়া“
”করো, যে আগুন থেকে বেরিয়ে ছাই পড়েছিল।

বাকি জীবন

নাজওয়া আর বিয়ে করেনি। বৃদ্ধা হয়ে গেল। প্রত্যেক রাতে গাছের নিচে বসে থাকত – মরুভূমির দিকে তাকিয়ে, যেন এখনো কিছু কিংবা কাউকে খুঁজছে। লোকেরা জিজ্ঞেস করত, “এত বছর পরও তুমি কি ওই ”?সাইফের অপেক্ষায় আছ

নাজওয়া হাসত। বলত, “না, সাইফের অপেক্ষায় নই। আমি অপেক্ষায় আছি সেই ছাইয়ের – যেখানে আমি বাস করেছি। কারণ বন্ধু, ছাই আগুনের শেষ নয়; বরং আগুনের চূড়ান্ত প্রতিশ্রুতির নাম। আর সব শেষের ভেতর ”লুকিয়ে থাকে নতুন শুরুর ইঙ্গিত – তা যদি পৃথিবীতে এক ফোঁটা অশ্রুও হয়।

গল্পের অবশেষ

বেদুইনরা আজও বলে, ওই বাবলা গাছের কাছে ভাঙা কাচের শিশি পড়ে থাকে, রোদে ঝিকিমিকি করে। পাথরের খোদাই ধীরে ধীরে মুছে যায়। আর প্রতিদিন সকালে বালির ওপর পড়ে থাকে নাজওয়ার বসার দাগ – এক ফোঁটা অশ্রুর পাশে আরেক ফোঁটা অশ্রু, মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম আর প্রতিশ্রুতির অসমাপ্ত কাহিনি যেন প্রতিনিয়ত লিখে যায়। ছাই যখন উড়ে যায়, তখন বাতাসেরা জানে – কোথাও না কোথাও একজন অপেক্ষা করে। যে অপেক্ষা আর কখনো শেষ হয় না, কারণ ছাইয়ের প্রতিশ্রুতি আগুনের থেকেও বেশি পোড়ে, কিন্তু কখনো পুরোপুরি পুড়ে যায় না – যেমন রয়ে যায় স্মৃতি, রয়ে যায় প্রেম, রয়ে যায় দগ্ধ আশার অমর আভাস।

গল্প শেষ।